দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 15 OCT 1995
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

জাতীয় শিক্ষা বিষয়ক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে

মমতাজ বিলকিস

এখন থেকে দেশের সকল সরকারীও বেসরকারী কলেজ এবং সমপর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য ভর্তি পরীক্ষার দরকার হচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে অর্থাৎ এসএসসি ও এইচএসসির প্রাপ্ত নম্বরের ক্রমানুসারে ভর্তি করা হবে।

এছাড়া দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়, বিআইটি এবং মেডিক্যাল কলেজসমূহে শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে বলে এক সরকারী তথ্য বিবরণীতে বলা হয়।

আমাদের মৌলিক চাহিদাগুলোর মধ্যে শিক্ষা একটি। আমাদের কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে একেবারে যে উদাসীন নয় তার প্রমাণ আমরা মাঝে মধ্যে পেয়ে থাকি। বিষয়টি নিয়ে আলাপ-আলোচনা ও পরিকল্পনা করা হয়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদক্ষেপও নেয়া হয়ে থাকে। তবে এসব পদক্ষেপ বা পরিকল্পনা কতখানি সময়োপযোগী এবং বাস্তবসম্মত তা ভাববার বিষয়।

এসএসসি পরীক্ষার যে পদ্ধতি গত কয়েক বছর ধরে চলে আসছে তার ফলে অসম্ভব রকম ভাল রেজাল্টের ছড়াছড়ি চারদিকে। আট/দশ বছর আগে যেমন প্রথম বিভাগে পাস করা বেশ কঠিন কাজ ছিল, এখন ফেল করা ঠিক ততটাই শক্ত। ফলে কেবল সাধারণভাবে পাস করা ছাত্রই নয়, অসংখ্য স্টারকেও পাসের মান যাচাই অর্থাৎ কলেজ ভর্তি পরীক্ষায় বসতে হয়। এতে পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল খাটো হয়ে যায়, তাই ভর্তির জন্য নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। নতুন পদ্ধতি অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে।

দীর্ঘ দশ-এগারো বছর একটানা পড়ালেখা করে এসএসসি পরীক্ষা দেয়ার পর ছাত্রছাত্রীরা একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবে। কলেজ জীবন শুরু করার আগে তারা নিশ্চিত মনে একটু ঘুরবে বেড়াবে, অথবা গল্পের বই পড়বে। ভর্তি পরীক্ষার পড়ার গুরুভার তাদের বহন করতে হবে না। দৌড়াতে হবে না কোন কোচিং সেন্টারে। অভিভাবকরাও একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচবেন। সর্বোপরি এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলকে গুরুত্বও দেয়া হবে। কিন্তু প্রশ্ন আসছে পাবলিক পরীক্ষাগুলোর ফলাফলের সততা নিয়ে। ছাত্রছাত্রীদের প্রাপ্ত নম্বর দেখে কি কর্তৃপক্ষ বলতে পারবে এটা তার প্রাপ্য? এসএসসি পরীক্ষার আগে এ সিদ্ধান্তের কথা জানতে পারলে পরীক্ষার্থীরা অধিক মনোযোগী হতে পারত। ভাল ফলের জন্য ততোধিক সচেষ্ট হতো। অভিভাবকরাও সচেতন হতে পারতেন। তবু যাহোক পরীক্ষা পদ্ধতির কারণে রেজাল্ট ভাল হচ্ছে তাই এতো অসুবিধায় পড়তে হবে না তাদের অধিকাংশকে।

অন্যদিকে নানাভাবে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিক পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের। পূর্ববর্তী পরীক্ষায় অতিসহজে অধিক নম্বর পেয়ে এসে তারা ধরেই নিয়েছে যে, ভাল রেজাল্ট করতে চাইলে খুব বেশি পড়তে হয় না। ফলে 'আকাশের তারকা মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে।' প্রশ্ন ব্যাংকের বদৌলতে ফাঁকি দিতে পারছে না। তাই গ্যাপ থেকে যাচ্ছে, যা মেকআপ করতে হিমশিম খেতে হচ্ছে কলেজে এসে। সেখানেও সাজেশন ভিত্তিক লেখাপড়া। মূল বইয়ের অনেকটা অংশেই তাদের পড়তে হচ্ছে না। যে অংশটুকু পড়ছে সেখানেও সন্দেহ থেকে যাচ্ছে। সদ্যসমাপ্ত এইচএসসি পরীক্ষায় অসদুপায়, ভাংচুর, বিক্ষোভ, সংঘর্ষ নানা তুলকালাম কাণ্ড ঘটেছে। এমতাবস্থায় পরীক্ষায় কে বেশি নম্বর পেল, আর কে কতটুকু শিখল, এর বিচার কিভাবে করবেন শিক্ষা বিষয়ক কর্ণধাররা? তাই শিক্ষা ব্যবস্থার গোড়ায় যে ব্যাধি সংক্রামক আকার ধারণ করেছে, তা আগে নির্মূল করা দরকার বলে মনে করছি।

স্কুল-কলেজের কথা বাদই দিলাম। দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবল ভর্তি পরীক্ষারই নয়, অনার্স পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হবার ঘটনাও ঘটেছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রশ্ন পরীক্ষার আগেই জানাজানি হয়েছিল কিছুদিন আগে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা কেলেঙ্কারি তদন্ত কমিটির তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকসহ দু'জনকে বরখাস্ত ও দর্শন বিভাগের ৪ জন শিক্ষকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে সম্প্রতি। প্রশ্নপত্র ফাঁস করেই অনেকে ক্ষান্ত হন না। উত্তরমান তৈরি করে দু'শ' থেকে পাঁচ হাজার টাকাতে বিক্রি করে থাকেন বলে শোনা যায়। একশ্রেণীর বোর্ড কর্মচারী, পরীক্ষক ও দালালের দ্বারা যশোর বোর্ডের এবারের এইচএসসি পরীক্ষার সাত শ' খাতা খুলনায় এক হোটেলে আনা হয়েছিল। পরে সেগুলো উদ্ধার করা হয়। কম্পিউটার বিভ্রাটের কারণে কক্সবাজার জেলার এসএসসির ফল পুনর্বিবেচনা করা হয়েছে। প্রকাশিত হয়েছে সংশোধিত ফল। ত্রুটিমুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি বিষয়ক সেমিনার বহুবার হয়েছে এদেশে। কিন্তু প্রকৃত কাজ কিছুই হয়নি। এখন এর প্রতিকারের আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মানুষ তৈরির কারখানা আর শিক্ষকগণ হলেন কারিগর। উপরিউক্ত ঘটনাবলী জাতির জন্য দুর্ভাগ্য বৈ কিছুই নয়। আবার সৈয়দ মুজতবা আলীর 'পণ্ডিত মশায়', যার মাসিক আয় সেই ইংরেজ স্কুল ইন্সপেক্টরের কুকুরের একটা পায়ের সমান, তেমন শিক্ষকের দেখাও পাওয়া যায়।

সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে শিক্ষা সচিব মোঃ ইরশাদুল হকের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য, দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যবৃন্দ, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধানগণ এবং ঢাকা মহানগরীর ডিগ্রী কলেজসমূহের অধ্যক্ষবৃন্দের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এক সভায় মেধানুক্রম ভর্তির সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যা ৭ সেপ্টেম্বর দৈনিকগুলোতে প্রকাশিত হয়। যেহেতু পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে স্নাতক পর্যায়ের ছাত্রছাত্রী নির্বাচন করা হবে, সেহেতু সর্বাগ্রে প্রয়োজন পাবলিক পরীক্ষাসমূহকে অধিকতর উন্নত, সুষ্ঠু, বস্তুনিষ্ঠ ও দুর্নীতিমুক্ত করা। পাবলিক পরীক্ষাসমূহের ফলাফল জ্ঞানের ভিত্তিতে নিশ্চিত করার পর মেধানুক্রম ভর্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ হবে যুক্তিসঙ্গত। এমনও দেখা গেছে, সাধারণভাবে ১ম বিভাগে পাস করা ছাত্র বুয়েট, মেডিক্যাল কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় টিকে গেছে, আবার স্ট্যান্ড করা ছাত্রও চান্স পায়নি। তাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আগে এসব বিষয় ভাবতে হবে। হট করে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তা সাধারণের ওপর চাপিয়ে দিলে নানা বিপত্তির সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা বেশি। যেমন এবারের এইচএসসি পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে ছাত্রছাত্রীরা হঠাৎ জানতে পারল ব্যবহারিক পরীক্ষা নিজ নিজ কলেজে হবার পরিবর্তে এবার স্ব স্ব পরীক্ষা কেন্দ্রে হবে। সবসময় নিজের কলেজে প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা হয়ে এসেছে। হঠাৎ করে এমন খবর শুনে ছাত্ররা অসহায় বোধ করেছে। এটি একটি ভাল সিদ্ধান্ত, কিন্তু আরও এক বছর আগে ঘোষণাটি দেয়া হলে ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক কাউকেই হঠাৎ চিন্তিত হতে হতো না। কারণ অনেক কলেজে প্র্যাকটিক্যাল শেখানোর মতো ইক্যুইপমেন্ট বা উপকরণ পর্যন্ত নেই। কোথাও কোথাও শিক্ষকরা নিজে প্র্যাকটিক্যাল করান, ছাত্ররা কেবল দেখে শেখে।

পরীক্ষা চলাকালীন সময়েই গতবারের মতো এবারও কোচিং সেন্টারগুলোতে ভর্তি শুরু হয়ে যায়। শুধু বুয়েট কিংবা মেডিক্যাল কিংবা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির জন্য কোচিং করলেই যে ভর্তি হওয়া যেত তার তার কোন নিশ্চয়তা ছিল না। তাই একাধিক প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবার মতো যোগ্যতা অর্জনের জন্য ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি হতে হয়েছে কোচিং সেন্টারগুলোর বিভিন্ন বিভাগে। এর জন্য প্রতি ছাত্রছাত্রীকে ৩-৫ হাজার টাকা ভর্তি ফিস দিতে হতো। ভর্তি ইতোমধ্যে প্রায় শেষ। ক্লাস কোথাও কোথাও শুরু হয়ে গিয়েছিল। এমতাবস্থায় হঠাৎ বলা হলো দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য কোন পরীক্ষা দিতে হবে না। ফলে কোচিং ফি দেবার টাকাটার কি হবে? আর তাছাড়া সিদ্ধান্ত কবে থেকে কার্যকর হবে তা সঠিকভাবে না বুঝতে পারায় ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সকলকেই উৎকণ্ঠায় থাকতে হচ্ছে।

জাতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষা ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রকদের ভূমিকা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নত ও বাস্তবমুখী করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় যে কোন গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত নিতে পারে, বা তা কার্যকর করার সুপারিশ করতে পারে। তবে সব ধরনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ঘোষণা দেবার আগে ভেবে দেখতে হবে সেটা কতখানি সময়োপযোগী। এবারের ভর্তি বিষয়ক সিদ্ধান্তটি কার্যকর করার আগে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষাসমূহকে উন্নত, সুষ্ঠু, দুর্নীতিমুক্ত ও বস্তুনিষ্ঠ করার বিষয়টি ভাববার জন্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাচ্ছি।